Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 318 - 323
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 318 - 323
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

‘দ্য লাস্ট সিটি’ : একটি সৃজনশীল আত্মপ্রকাশ

দীপান্বিতা আচার্য
অতিথি অধ্যাপক
প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়, গুয়াহাটি
Email ID : depanwitaacharjee@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Brahmaputra, Middleclass, Emargency, City, Love, Self-confidence.

Abstract
The Bengali novelists of the Brahmaputra region have made a remarkable contribution of the Bengali Literature. Migration, social conflict, resentment etc has already began to a new narrative of Bengali novels. Mridul kanti Dey is a renowned writer in the Northeastern and Bengali literary world. His novel "The Last City" is about the small incidents of life and how Tanushankar involved himself with them. The writer has described in detail how he tried to establish himself from Guwahati city to Kolkata. The novel deals with how the lifestyle of the middle class was affected, especially during the Emergency. Movement politics revolves around the novel and love, family, college life, moving from one city to another, struggling to establish with self-confidence. In this analysis we have tried to find out the uniqueness of this narrative.

Discussion

উত্তরপূর্ব কথা সাহিত্যের বিচরণক্ষেত্র মূলত লেখকদের অভিজ্ঞতাপুষ্ট সমাজ। সেখানে উঠে এসেছে সমাজের বিভিন্ন দিক। যেমন রাজনীতি, দেশভাগ, ইমারজেন্সি, সন্ত্রাস, অর্থনীতি প্রভৃতি নানা সমস্যা। প্রেম, ভালোবাসা, প্রকৃতি এসব ও সাহিত্যিকের নজর এড়িয়ে যায় নি। অসমের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ বহু প্রাচীন। তবুও এখানকারন বাঙালিদের নিজেদের অস্তিত্বের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে। অসমে বাংলা সাহিত্য চর্চা নানা প্রতিকূলতার মাঝখান থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। মানুষের হাসি কান্না, দুঃখ - দুর্দশা প্রেম ভালোবাসা তাদের বেঁচে থাকার লড়াই সাহিত্যের পাতায় পাতায় উঠে এসেছে। জীবনের টুকরো টুকরো ছবিগুলোকে সাজিয়ে সাহিত্যের পাতায় বন্দি করেছেন লেখকেরা। এ প্রসঙ্গে বলা যায় –

> “এখানকার বাঙালি ঔন্যাসিকদের মনোভূমিতে যে বীজগুলি রয়েছে তাতে এই পর্বের ইতিহাস কাল পরম্পরায় সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। এই প্রেক্ষাপট থেকে পাঠকৃতির যে বর্ণমালা তৈরি হয়েছে এযাবৎ এখানে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, আধিপত্যের ছবি, প্রতাপপিষ্ট অধস্তন বর্গ সমাজের আত্মনিমজ্জন, সত্তা সংকট ও বিমানবায়নের পরিসরকে।”[১]

উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই সকল সমস্যা লেখক মৃদুল কান্তি দের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। সমস্যাগুলোকে তিনি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা না করলেও তিনি একটি চরিত্রের মাধ্যমে জানাতে চেয়েছেন ব্যক্তি সম্পর্কের বিষমতাকে। ঔপন্যাসিকের ‘দ্য লাস্ট সিটি’ উপন্যাসের মূল হল আত্মপরিচয় অর্জনের প্রয়াস। এই প্রয়াসকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাই রয়েছে উপন্যাসে। এই

প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে চরিত্রের আত্মশক্তি। ভেতরের চালিকা শক্তিকে জাগ্রত করতে তার আত্মক্ষয়ী অধ্যবসায়কে অটুট রাখতে তাকে নিরবছিন্ন লড়াই করতে হয়েছে। এই প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাকে কিকি প্রতিকুলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে সেই বিষয়ে এখানে বলা হয়েছে।

গল্পকার ঔপন্যাসিক মৃদুলকান্তি দে বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক। দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা ছাড়া বাংলা সাহিত্যের আরও অনেক পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা রয়েছে। অসমের এই বাংলা লেখকের বর্তমান নিবাস কলকাতায়। অসমের বাংলা লেখকদের কথা বলতে গেলে প্রথম সারির লেখকদের মধ্যে মৃদুলকান্তি দের নাম অন্যতম। গল্পকার হিসেবেই তিনি সুপরিচিত। উপন্যাসও লিখেছেন তিনি। লেখক মৃদুলকান্তি দের জন্ম হয় ১৯৫৫ সালে। লেখকের উপন্যাসের সংখ্যা তিনটি। 'দ্য লাস্ট সিটি', 'চমকে উঠে গঙ্গাজল' ও 'এক পাড়ার মানুষ'। ছোটগল্পের বই রয়েছে কয়েকটি। সেগুলো হল 'বাড়ি ফেরার আগে', 'একটি নদী অনেক মানুষ', 'পরমা ফিরে এসেছে', 'শহরে বরফ গলছে'। লেখকের লেখা গল্প 'ভূমিকম্পের পরে' গল্প নিয়ে চলচিত্র তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের পরিচালক শৈবাল চৌধুরী এই চলচিত্র পরিচালনা করেছেন। লেখক কলকাতায় বসবাস করলেও ব্রহ্মপুত্র পারের জীবনশৈলী ভেসে উঠে উনার লেখায়। 'দ্য লাস্ট সিটি' লেখকের অন্যতম একটি উপন্যাস। সাহিত্যে প্রতিদিনকার পরিচিত জীবনচিত্রই আমরা তাঁর এই উপন্যাসে উঠে আসতে দেখি। মানুষের জীবনের নিত্যদিনের ঘটে যাওয়া নানা ছোট ছোট প্রসঙ্গ কিভাবে উপন্যাসের আকার নিতে পারে তা এই উপন্যাস পড়লে বোঝা যায়। ব্রহ্মপুত্রের জনপদকেই তাঁর বিভিন্ন লেখায় উঠে আসতে দেখেছি। কারন এই ব্রহ্মপুত্রের পাড়েই তাঁর বেড়ে উঠা। এখানের জনপদ তার আলো বাতাস এইসব নিয়েই উপন্যাসের পটভূমি তৈরি হয়েছে। লোহিতপারের তনুশঙ্কর আর কলকাতার তনুশঙ্কর এই দুই তনুশঙ্করের জীবনের টানাপোড়ন নিয়েই উপন্যাস। নিজের জীবনের সঙ্গে কোথাও যেন একটা মিল রেখেই হয়তো উপন্যাসিক মৃদুল কান্তি তাঁর উপন্যাসের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। ব্রহ্মপুত্র পারের লেখক কলকাতায় গিয়ে নিজের আলাদা জগত তৈরি করেছেন ঠিকই কিন্তু শিকড়ের টানকে অস্বীকার করে নয়।

সাহিত্যের পাঠক মাত্রই অনুধাবন করতে পারেন যে সাহিত্য হচ্ছে ইতিহাসের দলিল। সাহিত্যের প্রত্যেক পাতায় থাকে সমাজ ব্যক্তি রাষ্ট্র সংস্কৃতির ইতিহাস। উত্তরপূর্বের সাহিত্যেও সময় ও সমাজের বিষয় তার ইতিহাস, দেশভাগ, রাজনীতি, দাঙ্গা, ইমারজেন্সির সময়, উদ্বাস্তু সমস্যা, সংস্কৃতির বিষয় সবসময়ই বিশেষ জায়গা করে রেখেছে। লেখকের এই উপন্যাস সেই ধারাটিকে অনুসরণ করেই লেখা। আসামের নদী পাহাড়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তনুশঙ্কর। এই ব্রহ্মপুত্রের পারে তার জীবনের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। সেখান থেকে জীবন কিভাবে বয়ে নিয়ে যায় নতুন এক শহরের উদ্দেশ্যে এই বিষয় নিয়ে উপন্যাস। নতুন শহরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাকে যে সমস্ত পথ অতিক্রম করতে হয়েছে সেই সমস্ত পথের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতার ফসল এই উপন্যাস। মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনশৈলী, ইমারজেন্সির সময়কাল, আন্দোলন, রাজনীতি উপন্যাস জুড়ে তারসঙ্গে রয়েছে প্রেম, সংসারজীবন, কলেজ জীবন, ও এক শহর থেকে অন্য শহরে গিয়ে নিজের জীবন সংগ্রাম ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস। উপন্যাস সম্পর্কে বলা হয়েছে –

> "ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালি জীবনে সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতায় আরও একটি যাপনচিত্র মৃদুল কান্তি দের 'দ্য লাস্ট সিটি'। তবে এই উপত্যকার অস্থির জীবনাচরণ নয় বরং ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা, পণ্য মানসিকতার উদগ্র প্রকাশ, প্রেমের মানসিকতায় আস্তাহীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের প্রাণান্তকর প্রয়াসেই শেষ ঠিকানা খোঁজার যে অবিরাম গতি এখানকার বাঙালি মানসে ক্রিয়াশীল - এই উপন্যাস তারই নির্মাণ। বিশ্বাসের জগৎ থেকে বিশ্বাসহীনতায় সম্প্রসারিত হয়ে এই আখ্যান এখানকার বাঙালি জীবনের দলিল হয়ে উঠে।"[২]

ব্রহ্মপুত্র পাড়ের ইতিহাস ও তারসঙ্গে তনুশঙ্করের জীবনের গতি এই দুই বিষয়কে জড়িয়ে এগিয়ে গেছেন লেখক। চরিত্রের মনস্তত্বের বিবর্তন কিভাবে করেছেন তা উপন্যাসের পাতায় পাতায় বর্তমান। উপন্যাসের কাহিনির সুত্রপাত ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির কোলে বেড়ে উঠা তনু পৌঁছল ইট পাথরের নগরী কলকাতায়। তবে এই কলকাতা যাত্রার পথে তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে অনেক অভিজ্ঞতা। তনুর জীবনের সঙ্গে ও তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 318 - 323
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরিচিত হতে তার জীবনের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতাকে একত্রে সাজাতে লেখক কিছু বিশেষ বিষয়কে তার উপন্যাসের বয়ানে নিয়ে এসেছে। তবে তা ঔপন্যাসিকের জীবন অভিজ্ঞতাপ্রসূত, তা পাঠক মাত্রই অনুধাবন করবেন। মুলত ইমারজেন্সি, রেল আন্দোলনের সময়ের বাঙালি সত্তার যে দামাডোল পরিস্থিতি সেটা প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাসের চরিত্রে। পলায়ন বৃত্তি তারসঙ্গে রয়েছে শিকড়ের টান, এই পরিস্থিতিতে জড়িয়ে যায় তার জীবন। তার বিশৃঙ্খল জীবনের ঘটনাকে সাজাতে বিষয়গুলোর উত্থাপন।

প্রথমে বলতে হয় তনুশঙ্করের কবিমন নিয়ে। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা তার পরিচয় পাই কবি হিসাবে। সে সায়েন্সের ছাত্র কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে জড়িত। কলেজের দেওয়াল পত্রিকাতেই তার আত্মপ্রকাশ। উপন্যাসের শুরুতে রঞ্জনাদি তাকে বলেছিল –

> "তনুশঙ্কর মুখোপাধ্যায় লাইফ ইজ ডিফ, নক হার্ড। যে জায়গায় পৌঁছতে চাও, হাঁটার জন্য সবসময় তৈরি রাস্তা পাবে না।"[৩]

এই কথা তনুর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। বহমান ব্রহ্মপুত্রের স্রোত যেন তার জীবন কথার স্রোত। বাইরে থেকে যে স্রোত দেখা যায় তাতে রয়েছে জীবন সভ্যতার আকর। তনু দেখতে চায় অন্তসলীলা বেগমান নদীকে। তেমনি বাইরের তনুকে যেভাবে দেখা যায় সেটা সেই নদীর উপরের জলস্রোত মাত্র। বেগমান জীবনে অন্তর্নিহিত আছে আরেকটা জীবন যা সবাই উপলব্ধি করতে পারে না। তনু ভালোবেসেছে রিনকিকে। তার সঙ্গে তনুর আর্থসামাজিক ব্যবধান অনেক। তবু প্রেম সেই বাধা মানতে চায় না। কবি তনু উচ্চারণ করে –

> "আমাকে স্বস্তি দাও, ধৈর্যও
> বটবৃক্ষসম।
> ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মপুত্র মম"[৪]

তনুর হৃদয়াবেগ তাকে রূপকথার রাজ্যে নিয়ে যায়। যেখানে আছে রিনকির প্রেম, কবিতা, আড্ডা প্রতিদিন নতুন চাওয়া পাওয়া।

ব্রহ্মপুত্রের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে তনুশঙ্করের জীবন। ব্রহ্মপুত্রের জলের আশীর্বাদ নিয়ে এগিয়ে গেছে তনুশঙ্কর। তবে জীবন তো আর নদনদীর অনন্ত প্রবাহ নয় যে সব বাধা অতিক্রম করে সহজে এগিয়ে যাবে। তবে এগিয়ে যাওয়াই জীবন। প্রকৃতির অনন্ত সুন্দর পরিবেশে নির্জনতা তাকে শান্তি দেয়। করজোড়ে প্রার্থনা করে নদীর অন্তর্লীন আলোছায়ার কাছে স্বস্তির জন্য শান্তির জন্য।

দেশভাগ দাঙ্গা স্বাধীনতা ইতিহাসের এইসব বিশেষ কালপর্বে মধ্যবিত্তের সহজ সরল জীবনযাপনে নিয়ে আসে সংকট। আজন্ম যে সংস্কার ও মূল্যবোধ ছিল তার ভিত্তি নড়ে উঠেছিল কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে। সংকট, টানাপোড়ন, বিপন্নতা, অনিশ্চয়তা এইসব নিয়ে গড়ে উঠে মধ্যবিত্ত শ্রেনি। প্রসঙ্গক্রমে সমালোচকের উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে –

> "এ যেমন সত্য যে ঔপনিবেশিক চক্রান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সেই বিভাজিত বাঙালি আজ অভ্যন্তরীণ বিভাজন পন্থার শিকার, তেমনই আত্মবিশ্লেষনে এ ভাবনাও উঠে আসে যে এর মোকাবেলায় বিশ শতকের বাঙালি যতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, একুশ শতকে তারা যেন উট পাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে নিজেকে লুকিয়ে রাখার ব্যর্থ প্রয়াস করছে। এই বাঙালি আজ যেমন প্রান্তিকায়িত, অপরদিকে স্মৃতি বিলোপের শিকার।"[৫]

এই উপন্যাসে তনুশঙ্করের জীবনেও আমরা এই মধ্যবিত্তের জীবনের সংকট দেখতে পাই। সরকারী অফিসের কেরানী তার পিতা। একা পিতার রোজগারে আর সংসার টানা সম্ভব নয়। তাই পিতাপুত্রের মধ্যে একটা দুরত্ব বেড়ে চলেছে এবং মা সেই দুরত্ব দূর করতে ব্যস্ত। পিতার কষ্ট পুত্রের চেষ্টা এই দুয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মা। আর্থিক এই কষ্টের সমাধান হতে পারে তনুর দ্বারা এই আশায় বুক বেধে বসে থাকতে দেখি পরিবারটিকে। শুধু এই পরিবার কেন যেকোনো মধ্যবিত্ত পরিবারের ছবিকে যেন স্পষ্ট রূপ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। দেশের পরিস্থিতির স্বীকার এই মধ্যবিত্ত সমাজ। কৈশোর বয়সে

বাস্তবের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার এই অভিজ্ঞতা তনুর পরবর্তী জীবনেও প্রভাব ফেলেছিল। পিতা স্বর্ণকমলের ভয় যেন মধ্যবিত্ত সকল পিতার ভয় –

> "কবিতা লিখলে দারিদ্রমোচন হয় না, এই সারার্থ পলির উপর পলি জমে উঠার মতোই স্বর্ণকমলের বুকে ভার হয়ে ভয়ের সৃষ্টি করেছিল। কাঁধে ঝোলা মুখময় দাঁড়ি এই বেশে পত্রপত্রিকা আর সভাসমিতি করে বেড়ালে চাকরি জুটবে কখনও!"[৬]

২৫ জুন ১৯৭৫ থেকে ২১ মার্চ ১৯৭৭ পর্যন্ত ভারতে যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসের পটভূমি রচিত। সেই সময় মধ্যবিত্তের যে সংকট দেখা দিয়েছিল উপন্যাসে তাই আমরা দেখতে পাই। লেখকের বিচরণ ক্ষেত্র স্বভাবতই ছিল তার অভিজ্ঞতাপুষ্ট সমাজ। সেই সময়ের রাজনীতি অর্থনীতি সন্ত্রাস প্রভৃতি নানা সমস্যায় কমবেশি জর্জরিত ছিল মধ্যবিত্তেরা। বলাবাহুল্য সেই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতেও মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষেরা সুখে দুঃখে হাসিকান্নায় বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। ঔপন্যাসিক তনুশঙ্করের পিতা মাতা ও ছোটবোনকে নিয়ে যে ছোট ছোট পারিবারিক মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন তা থেকে সে ধারনা স্পষ্ট। স্বর্ণকমলের চিন্তা সুপর্ণার স্নেহ এইসব বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তনুশঙ্করের কাকা সূর্য ও কাকিমা নীলার সংসার যেন কলকাতার দরিদ্রতার নির্মম বাস্তবতাকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। ইমারজেন্সির সময় কাজকর্মের সন্ধানে মানুষ হাহাকার করছে। যারা কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদেরও চিন্তার শেষ নেই। সূর্যকাকার কথায় আমরা তখনকার পরিস্থিতির সামান্য আভাস পাই –

> "তনু, তোর বাবার পাঠানো টাকা আমি কবে ফেরত দিতে পারব নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারছি না। বড় অসুবিধার মধ্যে আছি। কারখানা খুলবে না, বলছে তো অনেকে। বলতে বলতে সূর্যকাকার গলা বুজে আসে।"[৭]

সূর্যকাকার বেদনা অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাওয়া মানুষের আর্তনাদ।

আর্থ সামাজিক ব্যবধান সমাজের সর্বত্রই রয়েছে। তনুর জীবনেও সেই ব্যবধান একাকীত্ব নিয়ে আসে। রিনকির প্রতি তার প্রেম সেই ব্যবধানের জন্য প্রভাবিত হয়েছিল। সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের মেয়ে ও সামান্য সরকারী অফিসের কেরানীর ছেলের প্রেমের সম্পর্ক প্রভাবিত হওয়াটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। রিনকির যতই কাছে আসার চেষ্টা করুক তনু, অদৃশ্য খড়ি দিয়ে টানা একটি বৃত্ত সবসময় রয়েছে তার চারপাশে। কিন্তু এই প্রেম তাকে অন্তপুর থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। তনুর কথায় –

> "নিজেকে উচ্ছন্নে নিয়ে যাচ্ছি, এই ভর্ৎসনা বাবার কাছে শুনতে হয়েছে বহুবছর। এক বারোমাস থেকে অন্য বারোমাস। দীনহীনতার গ্লানি নিঃসঙ্গতার অন্তপুরে নিয়ে যায়। তোর হাত ধরে এই অন্তপুর থেকে বেরিয়ে এসেছি কতবার, রিনকি। সেগুনবাগান দেখেছি, মেঘমল্লার শুনেছি। আমার সাধ হয়, আমাকে বোঝার প্রশ্রয় আর প্রসারিত হাত তোর কাছ থেকে যেন পেতেই থাকি। এক বারো মাস থেকে অন্য বারোমাস।"[৮]

প্রেমের টানেই কলকাতা যায় তনু। শহরে প্রচুর মানুষ কিন্তু তনু যেন একা। সেখানেও তাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে ভালবাসা। রিনকির প্রতি তার ভালবাসা আর কবিতার প্রতি তার টান।

কলকাতা শহরের দৃশ্য প্রতিটি পদক্ষেপে শ্লোগান, রাজনীতি, বিজ্ঞাপন তাকে ভাবিয়ে তোলে। শহরের কারখানা ট্রেনের হুকার, মানুষের লড়াই দেখে সে যেন হঠাৎ দায়িত্বশীল হয়ে উঠে। তাই পুনরায় ব্রহ্মপুত্র পারে এসেই কাজের সন্ধানে এগিয়ে যায়। হঠাৎ যেন প্রাপ্তমনস্ক হয়ে পরে সে। কিন্তু এখানে তার মন থাকে না, তার হৃদয়াবেগ তাকে নিয়ে যায় রূপকথার রাজ্যে। যেখানে বাধা বিপত্তির প্রতিকুলতা নেই। সেখানে কেবল রিনকির প্রেম, কবিতার প্রিয় কাজ, আড্ডার আনন্দ তাকে দুহাত তুলে ডাকে। তারসঙ্গে নিজের দায়িত্ববোধ তাকে নিয়ে চলে কলকাতার উদ্দেশ্যে। পুনরায় সে পাড়ি দেয় শহর কলকাতায়। ঘরের অমতে নিজের দায়িত্বে সে চলে যায় কলকাতায়।

পুনরায় কলকাতায় আসার পর তার শুরু হয় অস্তিত্বের সংগ্রাম। টিউশনি করে থাকার ব্যবস্থা করে কোনোমতে মাথাগুজার স্থান পায় সে। বিরাট এই শহরে যে তার এই ব্যবস্থাটুকু হয়েছে এইটাও যেন তার পরম প্রাপ্তি। সে বলে-

> "এই বিরাট শহরে এক সময় অনেক দানবীয় ছিল। বইতে পড়েছি। এখন কোথায়? এই যে তুমি থাকবে, দুবেলা খাবারটুকু পাবে, এই পাওনাটুকু তোমার কাছে সামান্য নয় কিন্তু।"[৯]

এখানে ধীরে ধীরে নিজের মতো করে থাকতে শুরু করেছে। স্বভাববশতই সবকিছুকে আপন করতে তার সময় লাগেনি। কিন্তু এই কলকাতায় দ্বিতীয় বার আসার পর বুঝতে পেরেছে বাইরে থেকে এই মহানগর দেখতে যতটা সুন্দর ভেতরে ঢুকলে দেখা যায় এই সুন্দর শহরের বুকে কিভাবে অক্লেশে আবর্জনা ফেলে যায় মানুষ। ব্রহ্মপুত্রের তটরেখা ছেড়ে কলকাতায় তনু এসেছিল রিনকির টানে কিন্তু এখানে এসেই সে বুঝতে পেরেছে নিরাশ্রিত জীবনে একথালা ভাত পাওয়াটাও এখানে আকাশ কুসুম ব্যপার। রুজি রোজগার মাথায় ঘাম ফেলে পরিশ্রম না করলে তা জুটবে না। অন্ন কি দুর্লভ জিনিস তা কলকাতায় না আসলে বোঝা কঠিন। অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্ব তাকে শেখায় এই শহর কলকাতা। জীবনের এই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম তাকে দূরে নিয়ে আসে রিনকি থেকে তার প্রিয় কবিতা থেকে।

কলকাতায় টিকে থাকতে তনুশঙ্কর বেছে নেয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই। কবিতা ছেড়ে সে লিখতে শুরু করে তদন্তমূলক প্রতিবেদন। জমি বেদখলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় তার কলম। তারজন্য সে শত্রু হয়ে পরে ভূমাফিয়াদের। কলকাতায় এসে শুরু হয় তার নতুন সংগ্রাম। তখন তার ব্যক্তিগত জীবনও প্রভাবিত হয়। রিনকি তার নতুন কবিতার বই সমর্পণ করে অভিমন্যুকে। কারন তার জন্যই তার বই প্রকাশিত হয়েছিল। তনু বলেছে-

> "মত প্রকাশের স্বাধীনতা আমার আছে। অধিকার অর্জনের লড়াই থেকে এই শহরের মানুষেরা বিরত থাকেনি।"[১০]

কোনও পলিটিক্যাল পার্টির সাপোর্ট তনুর ছিল না তাও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিপ্লবী তনু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার পাশে কেউ না থাকলেও সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে গেছে। একদিকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই একদিকে রিনকির ধীরে ধীরে দূরে চলে যাওয়া, এই দুইয়ের স্তব্ধতা তনুকে গ্রাস করে নেয়। রিনকির দূরে চলে যাওয়ার কারন হিসেবে বলা যায় –

> "তনু জেনে গেছে, অভিমন্যুর প্রতি রিনকির আকর্ষণ কম নয়। তনুর কাছ থেকে সরে এসে, অনায়াস ভঙ্গিতে যেভাবে অভিমন্যুর সঙ্গে চলে গেল রিনকি, এটা স্পষ্ট, রিনকির ওপরে ওঠার সিঁড়ি অভিমন্যু। অফুরান সিঁড়ির ধাপ। এক ধাপ উপরে ওঠা মানে, টুপিতে একটি নতুন পালক। এরকম অনেক পালক অভিমন্যু নিশ্চয় দেখিয়েছে রিনকিকে।"[১১]

ঈর্ষাপরায়ণ মনোভাব নিয়ে তনু সেদিন একটা ভুল করে ফেলে। সে কুড়ল নিয়ে আঘাত করতে যায় অভিমন্যুকে। কলকাতা শহর যে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল ধীরে ধীরে সকল আশ্রয় থেকেই সে দূরে আসতে থাকে। শহরের ভৌগলিক সীমা অনেক বড় হলেও তনুর আশ্রয়ের জন্য ভিক্ষা করতে হয়। অপমানের তির্যক বানও তাকে সহ্য করতে হয়েছিল। রিনকি তাকে বলে এই শহর থেকে পালিয়ে যেতে। তনু আবার ফিরে যায় ব্রহ্মপুত্রের সান্নিধ্যে। ব্রহ্মপুত্রের বুক সমান জলে সে নিজেকে শুদ্ধ করতে চায়। ব্রহ্মপুত্রের কাছে তনু নিজেকে সমর্পণ করে বলে –

> "আমাকে যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ দাও, হে মহত্তম নদ। জলের ঠাণ্ডা স্পর্শ শান্তি। কতদিন পরে মনে হল তার, গ্লানি নেই। দেহ মন নির্ভর। ভ্রুকুটির সব দাগ যেন মুছে গিয়েছে।"[১২]

নিজেকে শুদ্ধ করে পুনরায় সে উপস্থিত হয় মায়ের কাছে। সে ফিরে পায় তার হারানো জগৎ। তনু নিজেকে নতুন করে বিশ্লেষণ করে-

> "যখনই নিজেকে নিজের চেতনাবোধ সত্ত্বা দিয়ে অনুভব করেছি অমনি পরিপার্শ্ব অভ্যুথানের সামরিক প্রধান। এরকম সামাজিক ব্যবস্থা একটা বিন্দুতে এসে আর মেনে নেওয়া যায় না। আমার ওখানে পড়ে থাকাটা ওই বিন্দু পর্যন্ত পৌছনোর সময়।"[১৩]

সময় তার শুদ্ধিকরণে সাহায্য করেছে। কিন্তু অস্থির মনে নিস্ক্রিয়তার অবসাদ এমনই যে তার কল্পনাশক্তি যেন অন্তর্নিহিত। তার এই বন্দী জীবন থেকে মুক্তি দিতে তাকে পুনরায় তার কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করতে হয়েছে। হৃদয়ের রঙ

তুলিতে পুনরায় সে আঁকতে শুরু করেছে। তার কল্পনাশক্তি দ্বারা পরিশালিত আত্মপ্রকাশ ঘটে। সে সাহস করে নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি করে পুনরায় শেষ শহর কলকাতায় যেতে চায়। যে কলকাতা তাকে স্বাবলম্বী হতে শিখিয়েছে সেখানে সে তার জীবনের অন্তিম সময় কাটাতে চায়। যেখানে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সমালোচকের ভাষায় –

> "কিন্তু কলকাতায় গিয়ে সূর্যকাকার অসহায়তা, অন্তর্যামী প্যালেসের নির্মম আধিপত্যচক্র, স্বার্থ বাহসমাজের চক্রান্ত ফাঁস করে দেওয়ায় তার লিখন সত্তার উপর আক্রমণ এবং সর্বোপরি রিনকির প্রত্যাখান- বহুমুখী প্রত্যাখানের মুখোমুখি হয়ে তনুশঙ্কর বোঝে, জীবনের বাস্তবতার দূরবর্তী সীমা রূপকথার আমেজ নিয়ে হাজির হলেও তা মূলত বাস্তবই থেকে যা। জীবনের এই রূঢ় বাস্তবতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। মৃদুল কান্তি তুমুল দক্ষতায় বাঙালি জীবনের এই বাস্তবতাকেই তাঁর আখ্যানে নিয়ে আসেন। এই তাৎপর্যে পৌঁছে কাহিনির অন্তবৃত্ত সত্য ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালি জীবনের রুপায়নকে সার্থক করে তোলে।"[১৪]

আশাবাদী একটা মনস্তত্ব দিয়ে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের ইতি টেনেছেন। জীবনের অন্তিম শহর কলকাতায় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাড়ি দেয় তনুশঙ্কর।

ঔপন্যাসিক তনুশঙ্করের জীবনে প্রেম, ভালবাসা, কল্পনা, তারসঙ্গে জড়িয়ে রেখেছেন সৃজনশীল আত্মপ্রকাশ। চেনা শহর থেকে অচেনা শহরে নিজেকে নতুন করে দেখার অনুপ্রেরণা পায় সে। তবে তার শিকড়ের টান, ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের তার শৈশবের অনুভূতি তার প্রথাগত জীবনে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে অনবরত। সকল বাধা বিপত্তি পেরিয়ে জীবনের অন্তিম শহরের ডাকে সে সাড়া দিয়েছে।

Reference:

১. সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময়, 'আখ্যানের সন্ধানে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা উপন্যাস', 'Prag Consilience', জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত (সম্পা.), Vol 4 No 1 August 2019, গুয়াহাটি, পৃ. ১১৯
২. সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭
৩. দে, মৃদুল কান্তি, 'দ্য লাস্ট সিটি', গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৭
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩
৫. সব্যসাচী রায়, 'দেশভাগ ও ছিন্নমুলের যাপনকথা', 'নাইন্থ কলাম', প্রসূন বর্মণ (সম্পা.) ISSUE XVII, VOLUME XXII December 2022, গুয়াহাটি, পৃ. ১৮৩
৬. দে, মৃদুল কান্তি, 'দ্য লাস্ট সিটি', গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ১০
৭. ঐ, পৃ. ৭৩
৮. ঐ, পৃ. ৭৯
৯. ঐ, পৃ. ৮৯
১০. ঐ, পৃ. ১১৪
১১. ঐ, পৃ. ১১৮
১২. ঐ, পৃ. ১২৬
১৩. ঐ, পৃ. ১২৮
১৪. সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময়, 'আখ্যানের সন্ধানে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা উপন্যাস', 'Prag Consilience', জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত (সম্পা.), Vol 4 No 1 August 2019 গুয়াহাটি, পৃ. ১২৮